গ্রন্থবীক্ষণ

মা নর্মদার তট : 'যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী'

তুলসীপ্রসাদ বাগচী

ডা: অনন্যা দাস, *মা নর্মদার তটে প্রাচীন তীর্থাবলী*, প্রকাশক : সৌম্যা রায়চৌধুরী, অনুপমা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২৩, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪১৬, ৮০০ টাকা।

নদীমাতৃক দেশ ভারতবর্ষকে একইসঙ্গে আধ্যাত্মিকতার ধারক ও বাহক বলা যেতে পারে। ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম ধাত্রী এইসব নদীকে আশ্রয় করে তাদের দুই তটে গড়ে উঠেছে নানা জনপদ। সেইসঙ্গে গড়ে উঠেছে বহু তীর্থক্ষেত্রও। উত্তর ভারত যেমন পবিত্র হয়েছে জাহ্নবী-যমুনার বিগলিত করুণাধারায়, মধ্যভারত তেমনই যুগ যুগ ধরে পবিত্র হয়েছে নর্মদা নদীর পাবন স্রোতোধারায়। প্রতিদিন অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থী মানুষ ব্যাকুল হয়ে ছুটে যান মা নর্মদার সন্নিধানে। দৈহিক ক্লেশ ও অন্যান্য অসুবিধাকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা ভক্তিবিনম্রচিত্তে প্রদক্ষিণ করেন নর্মদা মায়ীকে—একবার, দুবার, বারবার।

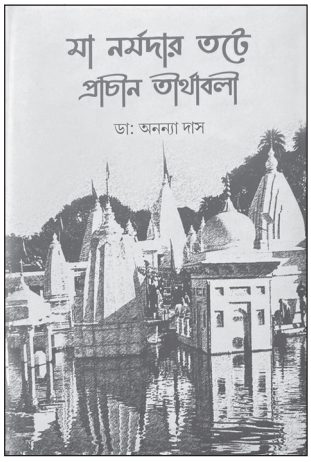

আমাদের সকল ধর্মগুরু ও শাস্ত্রকারগণই একবাক্যে তীর্থের মাহাত্ম্যকথা কীর্তন করেছেন। তাঁরা নিজেরাও বারবার তীর্থদর্শনে নির্গত হয়েছেন, কখনও নিঃসঙ্গ একাকী, কখনও শিষ্য-শিষ্যা সহ। এইরকম এক মহাতীর্থের নাম মধ্যভারতের পুণ্যতোয়া নর্মদা নদী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নর্মদা মায়ী আকর্ষণ করেছেন অসংখ্য সাধু, সাধক, মহাত্মা ও পুণ্যার্থীদের। সুদূর অতীতকাল থেকে বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা নর্মদার দুই তটে এসে মিলিত হয়েছে, হচ্ছে, হবে, হয়েই চলবে। নর্মদার উৎপত্তিস্থল থেকে মোহনা পর্যন্ত সর্বত্র তাঁদের সেই সাধনার পুণ্যপ্রভাব যেন জমাট বেঁধে আছে। নর্মদাতট পরিণত হয়েছে ভারতবর্ষের অন্যতম শিবভূমিতে। এই শিবভূমিতে প্রবেশ করলেই ভক্তহৃদয়ে সেই আধ্যাত্মিক-ভাবঘন স্পর্শমণির ছোঁয়া লাগে

ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণাগারের অবসরপ্রাপ্ত গবেষক-বিজ্ঞানী

অলক্ষ্যে, সমস্ত জাগতিক মালিন্য বা দ্বন্দ-সংঘাতের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে তাঁদের মন স্বতঃই অর্ন্তমুখী হয়ে ওঠে, ঈশ্বরমুখী হয়ে ওঠে। শিবদুহিতা মা নর্মদার দুই তট তাই আমাদের কাছে মহা তীর্থস্থান।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এত কষ্ট সহ্য করে ''বহু দিন ধরে' বহু ক্রোশ দূরে,/ বহু ব্যয় করি, বহু দেশ ঘুরে'' তীর্থ করতে যাওয়ার দরকার কী? মাতৃসাধনার সিদ্ধ সাধক-কবি কি লেখেননি—'কেন গঙ্গাবাসী হব?/ ঘরে বসে মায়ের নাম গাহিব'? ঈশ্বর তো সর্বত্রই সমানভাবে বিরাজমান। আমরা যেখানে রয়েছি সেখানে কি ভগবান থাকেন না? তাহলে আর আলাদা করে তীর্থস্থলের স্থানমাহাত্ম্য থাকে কী ভাবে? এই জিজ্ঞাসার অপূর্ব মীমাংসা শুনিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর সেই অমৃতকথা দিয়েই এই 'গ্রন্থবীক্ষণ' শুরু করা যাক।

সেদিন ছিল ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮।

স্বামীজীর বহুদিনের মনোবাসনা আজ পূর্ণ হয়েছে। বেলুড় মঠের নতুন জমিতে তিনি আজ হোম করে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন। আজ এক 'নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে'। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' শ্রীশ্রীঠাকুর ওই মঠে স্থির হয়ে থাকবেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি প্রিয়শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বললেন, ''ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামল।''

এরপর স্বামীজী ফিরে এলেন নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে। সেখানেই তখন সাময়িকভাবে মঠের কাজকর্ম চলছে। সন্ধ্যায় শিষ্যের সঙ্গে তিনি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করছেন। কথাপ্রসঙ্গে শিষ্য স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করলেন, ''মহাশয়, শাস্ত্রমুখে তীর্থাদি-স্থানের বিশেষ মহিমা অবগত হওয়া যায়, উহার কতটা সত্য?''

বলা বাহুল্য, এই প্রশ্ন তো শুধু তাঁর একার নয়, অসংখ্য সংশয়াত্মা মানুষেরও। আজও এই প্রশ্ন বারবার ওঠে মানুষের মনে। ভগবান তো বিভুরূপে সর্বত্র বিরাজমান। এ-বিশ্বনিখিল তো তাঁরই প্রতিমা—'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি'। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে এই অমৃতবার্তাই তো শুনিয়ে এসেছেন বিশ্ববাসীকে। তাহলে? বেদান্ত-কেশরী স্বামীজী বেদান্তের ভিত্তিতেই এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন—''সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন নিত্য আত্মা ঈশ্বরের বিরাট শরীর, তখন স্থান-মাহাত্ম্য থাকাটার বিচিত্রতা কি আছে? স্থানবিশেষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ—কোথাও স্বতঃ এবং কোথাও শুদ্ধসত্ত্ব মানবমনের ব্যাকুল আগ্রহে হয়ে থাকে। সাধারণ মানব ঐ-সকল স্থানে জিজ্ঞাসু হয়ে গেলে সহজে ফল পায়। এইজন্য তীর্থাদি আশ্রয় করে কালে আত্মার বিকাশ হতে পারে।''[১]

তীর্থদর্শন আধ্যাত্মিকভাবে কতটা উপকারী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, তবে তার পার্থিব উপকারিতাও কিছু কম নয়। এই বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী ড. রুপার্ট শেলড্রেক। তাঁর 'সায়েন্স অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিসেস' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, কোনও একটি পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ভ্রমণ করলে এবং শেষ পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত হতে পারলে সেটি আমাদের মধ্যে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনে এবং সেইস্থানের সঙ্গে আমাদের একটা আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কেন? কারণ, holiness-এর (পবিত্রতা) মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরমবস্তুর সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং সেই পরমবস্তুর সঙ্গে একটা নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। 'Holiness' শব্দটি এসেছে 'whole' (পূর্ণ) বা 'healthy' (স্বাস্থ্যকর) থেকে। যখন আমরা পরস্পরের থেকে, অতিমানবের পরিমণ্ডল থেকে, সকলের মূল সত্তার উৎস থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, তখনই

পবিত্রতা হারিয়ে ফেলি। যখন আমরা নিজেদের সীমিত অস্তিত্বের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে জীবনের উৎসমূলের সঙ্গে যুক্ত হই, তখনই প্রকৃত পবিত্রতা অনুভব করতে পারি। কোনও কোনও স্থানে গেলে এই অনুভবটি অন্যত্র লব্ধ অনুভূতির থেকে অনেক বেশি তীব্র হয়, এর কারণ সেই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হতে পারে, বা সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গগুণ হতে পারে, অথবা এই দুই কারণের সমাহারও হতে পারে।[২] একই সঙ্গে তীর্থদর্শনের পার্থিব উপকারিতাও কিছু কম নয়। এ-বিষয়ে ড. শেলড্রেক লিখেছেন, ''There have been few specific scientific studies of pilgrimage, but the evidence so far suggests that pilgrimages have a beneficial effect of reducing anxiety and depression." ভাবার্থ : তীর্থযাত্রার উপযোগিতা নিয়ে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে, তাতে জানা গেছে যে উদ্বেগ (anxiety) ও অবসাদ (depression) কমাবার ক্ষেত্রে তীর্থস্থানগুলির একটি ইতিবাচক ভূমিকা আছে।

উদ্বেগ, অবসাদ ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ওপর তীর্থস্থলের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন ড. পি. এ. মরিস। খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ভক্তদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান ফ্রান্সের লড্‌ৎস্‌ (Lourdes)। সেখানে চব্বিশ জন (নারীপুরুষ) বিশেষভাবে নির্বাচিত রোগীকে তীর্থ করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যাওয়ার আগে ও পরে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। দশ মাস পরে আবার পরীক্ষা হয়। দেখা গেছে অনেকেরই এতে উপকার হয়েছে। এ থেকে ড. মরিস সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, এই তীর্থদর্শনের ফলে অধিকাংশ তীর্থযাত্রীর জীবন উন্নততর হয়েছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যেসব অধ্যাত্মভাবাপন্ন মানুষ, যাঁরা সুদীর্ঘকাল রোগভোগ করছেন এবং সেই দুর্বিষহ অবস্থাকে মেনে নেওয়া কষ্টসাধ্য বলে মনে করছেন, তীর্থভ্রমণ তাঁদের আরোগ্যলাভের সহায়ক হয় কী না সেটা ভেবে দেখা যেতে পারে।[৩]

আজ থেকে প্রায় সওয়া শতাব্দী আগে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে স্বামীজী এই বিষয়ে যে-মূল্যবান উক্তি করেছিলেন সেটিও এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত : ''... প্রস্রাবে চিনি বা আলবুমেন (albumen) দেখা দিয়েছে বলেই 'হাঁ' করে বসো না। ও-সব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না।... খুব হাঁটো আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পারো ছুটি নাও, আর বদরিকাশ্রম তীর্থযাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রম যাওয়া-আসা একবার হলেই ও প্রস্রাবের ব্যারাম-ফ্যারাম ভূত ভাগবে। ডাক্তার-ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ—'ভাল করতে পারব না, মন্দ করব, কি দিবি তাই বল'। পারতপক্ষে ওষুধ খেও না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনের আনা!... সেধে রোগ অকালমৃত্যু ডেকে আনলে কে কি করবে?"[৪]

আলোচ্য গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তু নর্মদা-কেন্দ্রিক। নর্মদা নদী আমাদের কাছে অপরিচিত নয়, বাংলা-ভাষায় এই নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। নর্মদা নদীতে বাঁধ দেওয়াকে কেন্দ্র করে পরিবেশকর্মীরা অনেক আন্দোলন করেছেন। সেই বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে পত্রপত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। সেইসব বই বা লেখার গুরুত্ব স্বীকার করেও বলতে হবে যে এই বইটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যে স্বয়ংপ্রভ। ঠিক এইরকম বই বাংলাভাষায় আর দ্বিতীয়টি রচিত হয়েছে কী না আমাদের জানা নেই। এই একটি কারণেই গ্রন্থকর্ত্রী ড. অনন্যা দাস আমাদের ধন্যবাদার্হ। এই সুবৃহৎ বইটি লেখার জন্য বহু বছরব্যাপী (২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত) ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছেন লেখিকা। ব্যক্তিজীবনে তিনি দন্ত-শল্যচিকিৎসক (Dental Surgeon), একটি সরকারি হাসপাতালে কর্মরত। পেশাগত দায়দায়িত্ব

পালন করে কেবলমাত্র ভক্তি-ভালবাসার টানে বারবার ছুটে গেছেন মা নর্মদার ক্রোড়ে। নয়বার প্রদক্ষিণ করেছেন মা নর্মদার দুই তট। প্রদক্ষিণকালে তিনি নর্মদাতটে যেসব তীর্থস্থল ও মন্দির রয়েছে সেখানেও গিয়েছেন, গভীর মনোযোগ সহকারে দেখেছেন সেসব পবিত্র স্থান এবং তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। নর্মদা থেকে ফিরে এসে গভীরতর অভিনিবেশ সহকারে খুঁজেছেন নর্মদা-সংক্রান্ত শাস্ত্রাবলি এবং পুরাণগ্রন্থের পাতা, সন্ধান করেছেন এই বিষয়ক অন্যান্য অনেক বইপত্র (অধিকাংশই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য)। সেইসব মহান গ্রন্থের আলোকে তিনি বুঝে নিতে চেয়েছেন এইসব তীর্থস্থলের মাহাত্ম্য। তারপরে সংগৃহীত তথ্যাবলি সুসংহত করে তুলে দিয়েছেন আমাদের হাতে। এইভাবে বইটি নর্মদার তটবর্তী তীর্থস্থল সম্বন্ধে একটি মর্যাদাপূর্ণ বিশ্বকোষের রূপ ধারণ করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

ভক্তিমতী লেখিকা বইটি উৎসর্গ করেছেন পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে। গ্রন্থের শুরুতে উৎসর্গপত্রে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা সারদা দেবীর সর্বজনপরিচিত ছবি। তীর্থরাজ ও তীর্থজননীর ছবি দুটি যেন প্রথমেই বইটির মূল সুরটি ধরিয়ে দিয়ে পাঠক-পাঠিকার মনকে উচ্চগ্রামে বেঁধে দিয়েছে। ফলে বইটি আর পাঁচটা বইয়ের মতো ভ্রমণরসসিক্ত চপল কল্পকাহিনি হয়ে দাঁড়ায়নি, হয়েছে আমাদের প্রকৃত তীর্থসঙ্গী। ঠাকুর আর মা যেন অদৃশ্যভাবে আমাদের তীর্থযাত্রার সহযাত্রী হয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছেন, সবরকম পথের ক্লেশ ও সংকট থেকে সতত রক্ষা করছেন, তীর্থযাত্রার ফল প্রদান করছেন—এমন একটা দিব্য অনুভূতি অজান্তেই আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়। সেই কারণে, 'তীর্থভ্রমণ' আর তখন কেবলমাত্র 'দুঃখগমন' থাকে না, সেটি হয়ে দাঁড়ায় মা নর্মদাকে প্রদক্ষিণ করবার এক আনন্দদায়ক অভিযান, আশুফলপ্রসূ আধ্যাত্মিক সাধনা।

পশ্চিমবাহিনী নর্মদা নদীকে প্রদক্ষিণের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সেইসব নিয়ম মেনে লেখিকা তাঁর পরিক্রমা শুরু করেছিলেন মধ্যপ্রদেশের অনুপপুর জেলার অন্তর্গত অমরকণ্টকের মেকল পর্বত থেকে (এটিই নর্মদার উৎস)। কথিত আছে ভগবান আদি শঙ্করাচার্য এখানে একটি মন্দিরে বংশেশ্বর বা বেণেশ্বর মহাদেবকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে আরও অনেক মন্দির আছে। সেইসব মন্দিরের কথা লেখিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। নর্মদার দক্ষিণতট ধরে তিনি এগিয়ে গেছেন অমরকণ্টক থেকে নদীর মোহনার দিকে। গুজরাত রাজ্যের ভারুচ জেলার মিঠিতলাই-তে আরব সাগরে মিশেছে নর্মদার স্রোতোধারা। মোহনার কাছের তীর্থস্থানগুলিরও বর্ণনা দিয়েছেন তিনি।

অতঃপর মোটরবোটে তাঁরা মোহনার উত্তাল স্রোত পার হয়ে এসেছেন নর্মদার উত্তর তটে। সংগমের বিক্ষুব্ধ জলরাশির মধ্যে তাঁদের সেই রোমাঞ্চকর জলযাত্রার যে-বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা দেহে-মনে শিহরণ জাগায়। অবশ্য তার মধ্যেই সংগমের মাঝবরাবর এসে তাঁরা মা নর্মদা এবং আরব সাগরের উদ্দেশে পূজার্ঘ্য নিবেদন করেন যথাবিধি। নিরাপদে নর্মদার উত্তর তটে পৌঁছবার পরে তাঁর যাত্রা শুরু হয়—এটি নর্মদা পরিক্রমার দ্বিতীয়ার্ধ। এবারে মা নর্মদার উত্তর তটস্থ তীর্থাবলি দর্শন করতে করতে (বইয়ের দ্বিতীয়াংশে রয়েছে সেইসব তীর্থের বিস্তারিত বিবরণ) আবার অমরকণ্টকে নর্মদার উৎসে এসে পৌঁছে লেখিকা তাঁর পরিক্রমা শেষ করেন। তিনি লিখেছেন (পৃঃ ৩৬৮), ''অমরকণ্টকের উদ্দামকুণ্ড থেকে পরিক্রমার সংকল্প গ্রহণ করা হলে, এইখানেই পূর্ণ পরিক্রমার পর সংকল্প মায়ের চরণে সমর্পণ করে দিতে হবে। তৎপরে কন্যা ভোজন আদি তীর্থকর্ম

সম্পূর্ণ হলেই; পরিক্রমা অস্থায়ী পূর্ণতা লাভ হবে। পূর্ণ পরিক্রমা হবে, ঘাটে ঘাটে আহরিত নর্মদা জলে ভগবান ওঁকারেশ্বরের অভিষেকের শেষে।"

সেই শাস্ত্রবিধি মেনে তিনি পূজাদি করবার জন্য পুণ্যভূমি ওঁকারক্ষেত্রে গেলেন। সেখানকার তীর্থসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে বইয়ের শেষে। এখানেই শেষ হল তাঁর নর্মদা পরিক্রমা। কিন্তু, সত্যিই শেষ হল কি? বোধহয়, না। তাই অতৃপ্ত লেখিকা গ্রন্থশেষে (পৃঃ ৩৭৬) আবেগঘন ভাষায় লিখেছেন, ''ভক্ত সাধকের এই অশ্রুসিক্ত যাত্রাপথ কখনো শেষ হবে না। অলি-পদ্মের মতো ভক্ত-ভগবানের এই গুঞ্জনও কখনো থামবে না।...

''সেই অনন্তকে সান্তের শান্তসীমাতে বাঁধবার দুর্বল প্রয়াসও আজ শান্ত হলো। বাহ্যজগতের কলকোলাহলের অন্তরালে নর্মদা তটস্থ তীর্থ সমূহের নীরব আহ্বান!!! সব কর্মের বেড়াজাল পেরিয়েই সে ডাক আসে।..." অতঃপর তাঁর এই 'দুর্বল প্রয়াস' প্রাণদেবতাকে উৎসর্গ করে গ্রন্থ শেষ করেছেন—'ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু'।

আগেই বলেছি, এই বইটি মা নর্মদার তটস্থ প্রাচীন তীর্থাবলির বিষয়ে একটি ছোটখাট বিশ্বকোষের চরিত্র পেয়েছে। তাই এর শেষে একটি বিস্তারিত বিষয়সূচি (বর্ণানুক্রমিক) থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাহলে পাঠকের পক্ষে তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী কোনও একটি বিষয় খুঁজে নেওয়া সহজতর হবে। নর্মদা এখন একটি আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তাই বইটি অনতিবিলম্বে ইংরেজিতে অনুবাদ করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনও রয়েছে।

দু-একটি মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়ল, যেমন—'লক্ষ্মণ' হয়েছে 'লক্ষণ' (পৃঃ ৭৬-৭৭)।

গ্রন্থের বর্ণনাত্মক অংশ (পৃঃ ৩৭৬) শেষ হওয়ার পরে রয়েছে আর্ট পেপারে মুদ্রিত একটি রঙিন ছবির অ্যালবাম। প্রথমে আছে 'মা নর্মদার দক্ষিণ তটের প্রাচীন তীর্থাবলির চিত্রসমূহ' (পৃঃ ৩৭৭-৩৮৭), তারপরে 'মা নর্মদার উত্তর তটের প্রাচীন তীর্থাবলির চিত্রসমূহ' (পৃঃ ৩৮৮-৪১০), সবশেষে 'নর্মদা উপত্যকার চিত্রসমূহ' (পৃঃ ৪১১-৪১৪)। ছবিগুলি আর একটু বড় আর পরিষ্কার-ভাবে ছাপা যেতে পারত। একটাই অসুবিধা, আর্ট পেপারে ছাপা এই পৃষ্ঠাগুলি অতি সহজেই পরবর্তী পৃষ্ঠার সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে যায় যে সেই জোড় খুলতে গেলে মুদ্রিত ছবিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় (অন্তত এই আলোচকের কপিতে তাই হয়েছে)। এই বিষয়ে প্রকাশিকা মহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রচ্ছদপট গভীর ভাবোদ্দীপক ও দৃষ্টিনন্দন, এজন্য প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীঅসীম ঘোষ মহাশয় আমাদের ধন্যবাদার্হ।

যাঁরা মা নর্মদার ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাসের বিষয়ে আগ্রহী এবং যাঁরা নর্মদা-পরিক্রমায় নির্গত হওয়ার কথা ভাবছেন এই বইটি তাঁদের অবশ্যপাঠ্য। ✠

তথ্যসূত্র

১। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ*, *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৯, ২০০১, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃঃ ৭২

২। Rupert Sheldrake, *Science and Spiritual Practices: Transformative Experiences and Their Effects on our Bodies*, Brains and Health, First Counterpoint Edition, 2018, Counterpoint, Berkeley, California, CA 94710

৩। P.A. Morris, The Effect of Pilgrimage on anxiety, depression and religious attitude, *Psychological Medicine*, vol. 12, 1982, p. 291-294

৪। *বাণী ও রচনা*, *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*, খণ্ড ৬, ২০০১, পৃঃ ১৩৯